নোনাজল

বাদল সৈয়দ

তাম্রলিপি

নোনাজল
বাদল সৈয়দ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি : ৬৯১

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণ বিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মেসার্স সোমা প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৩৩৪.০০

Nonajol
By : A. S. M. Rahath
First Published : February 2023, by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 334.00 $7

ISBN : 978-984-97315-1-1

উৎসর্গ

খুরশীদ হোসেন বাপ্পি

আমি ঢাকা বদলি হয়ে এলেন, আর আপনি একেবারে চলে গেলেন!
কী কষ্ট! কী কষ্ট!

অতিথি

১। শরীফ সাহেব ভাতে ডাল মাখাতে মাখাতে বললেন, মা, আমার এক চাইনিজ বন্ধু আসছেন। কদিন থাকবেন। তোর অসুবিধা হবে?

মালিহা একটু অবাক হয়ে বললেন, অসুবিধা হবে কেন, বাবা? তোমার বায়াররা তো প্রায়ই আসেন।

শরীফ সাহেব একটু বিব্রত হয়ে বললেন, সমস্যা হলো মা, মিস্টার লি বাড়িতে থাকতে চান। হোটেল তাঁর পছন্দ নয়।

স্ট্রেঞ্জ বাবা! এর আগে কোনো বিদেশি অতিথি তো বাড়িতে থাকতে চাননি!

আসলে মা, লি আমার অনেক পুরানো বন্ধু। বায়ার না। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর আমি 'দেশ ইন্টারন্যাশনাল' নামের একটা গার্মেন্টসে জয়েন করেছিলাম, ও সেখানে কাজ করত। প্রায় তিন বছর একসাথে কাজ করেছি, বাংলাদেশে ওর তেমন কোনো বন্ধু ছিল না, আমি বাদে। দুজনে কিছুদিন এক বাসায়ও ছিলাম। তখনো আমি বিয়ে করিনি। তাই ঘনিষ্ঠতা খুব গভীর ছিল। সে সূত্রে সে আবদার করেছে বাসায় ওঠার।

কই আগে তো বলোনি।

দরকার মনে করিনি। অনেকদিন লির সাথে কোনো যোগাযোগ ছিল না—কয়েক সপ্তাহ আগে হঠাৎ সে মেইল দিলো, তারপর জানালো সে বাংলাদেশ আসতে চায়।

কেন?

এমনি, পুরানো স্মৃতি খুঁজতে। আমাদের যা বয়স মা, কেবল পুরানো দিন খুঁজে বেড়াতে ইচ্ছে করে। তোর মা লিকে খুব পছন্দ করত—কথাটা বলে শরীফ সাহেব থমকে গেলেন। মায়ের কথা মালিহাকে বলা উচিত

হয়নি। তিনি চান তার কথা মেয়েটার মনে না পড়ুক। তিনি জানেন, এখনো মেয়েটা প্রতি রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় অকালে হারিয়ে যাওয়া মায়ের কথা মনে করে কাঁদে।

মালিহা বাবার বিব্রত অবস্থা বুঝে তা ঢাকা দেওয়ার জন্য বলল, সমস্যা নেই বাবা, তুমি মিস্টার লিকে আসতে বলো। গেস্ট রুম তো ফাঁকাই পড়ে থাকে। আমি চিন্তা করছি ওনার খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা হবে কি না?

খুব একটা হবে না। এখানে যখন ছিল বাংলাদেশি খাবার খুব পছন্দ করত। নইলে হোটেল থেকে এনে নেবো। তবু আমি ওকে জিজ্ঞেস করে দেখব সমস্যা হবে কি না?

তা হলে তো প্রবলেম সলভড— নিয়ে আসো ওনাকে। কবে আসবেন উনি?

এপ্রিলের পনেরো তারিখ, এতক্ষণ পর শরীফ সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মেয়েটা খুব মুডি—একবার না করে দিলে বিপদ হতো, সে বাইরের মানুষের সাথে বেশি মিশতে পারে না। তিনি হেসে বললেন, থ্যাংকিউ, মাই লিটল ডার্লিং।

ওয়েলকাম, মাই ওল্ড বয়।

২। খাওয়া শেষে শরীফ সাহেব লিকে মেইল দিয়ে তাঁর বাসায় আমন্ত্রণ চূড়ান্ত করলেন। সেই সাথে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা জানতে চাইলেন।

কিছুক্ষণ পর লি উত্তর দিলেন, বাসায় থাকার আমন্ত্রণ জানানোয় তিনি অনেক কৃতজ্ঞ, তবে কিছুটা শঙ্কিত এতে শরীফ সাহেবদের ঝামেলা হবে কি না? বাংলাদেশে আসার জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তবে খারাপ লাগছে তাঁর স্ত্রীর জন্য। ছুটি না পাওয়ায় তিনি আসতে পারছেন না। যৌবনের একদম শুরুতে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বাংলাদেশে কাটিয়েছিলেন, সে স্মৃতি কখনো ভোলার নয়। কী আনন্দের ছিল দিনগুলো! ভালো কথা, তাঁর খাওয়া-দাওয়া নিয়ে চিন্তা করবে না। বাংলাদেশি খাবারের স্বাদ তিনি এখনো ভুলেনি।

শরীফ সাহেব লিখলেন, 'আমি এবং আমার মেয়ে তোমাকে গেস্ট হিসেবে পেয়ে খুব আনন্দিত। আর তুমি ব্যাপারটিকে ঝামেলা মনে করছ কেন? সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে যখন আমি দেশ ইন্টারন্যাশনালে জয়েন

করলাম, তখন তুমি এবং তোমার স্ত্রী কি জোর করে মেস থেকে আমাকে তোমাদের বাসায় তুলে আনোনি? বিয়ের আগ পর্যন্ত তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। আহা! শর্মি বেঁচে থাকলে কী যে খুশি হতো। তবে আমার ধারণা আমার মেয়েও তোমাকে একই যত্ন করবে। সে হয়েছে মায়ের মতো। বাইরে কঠিন, কিন্তু ভেতরে খুব নরম। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এমন মায়াবতী মেয়ে তুমি আর দেখোনি।

ফিরতি মেইলে চায়না থেকে লেখা হলো, আমি মালিহার সাথে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি। শর্মির জন্য আমাদেরও খুব কষ্ট হয়। ভালো থেকো।

শেষ মেইলটা পেয়ে শরীফ সাহেবের খুব মন খারাপ হয়ে গেলো। তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে। কী অসাধারণ মেয়েই না ছিল সে! তার চোখ ল্যাপটপের মনিটরের দিকে। কিন্তু মন পড়ে আছে বাইশ বছর আগে। সেদিন ছিল ২৭শে জুলাই। তিনি গিয়েছিলেন হেড অফিসে। মূলত প্রোডাকশনের লোক হিসেবে তাঁকে কাজ করতে হতো ফ্যাক্টরিতে। হেড অফিসে খুব বেশি যেতে হতো না। সেদিন গিয়েছিলেন কোম্পানির বড়ো সাহেব ডেকেছেন বলে। তাদের কোম্পানি আমেরিকায় পোশাক রপ্তানি করত।

তিনি যখন পৌঁছালেন বড়ো সাহেব তখন মিটিংয়ে ব্যস্ত, তাঁকে বলা হলো অপেক্ষা করতে। সময় কাটানোর জন্য তিনি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে গেলেন তাঁর বন্ধু শাহেদের সাথে সময় কাটাতে। গিয়ে দেখেন শাহেদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নতুন একটি মেয়ে জয়েন করেছে। শ্যামলা বর্ণের একটু লাজুক একটি মেয়ে। শাহেদই তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, শর্মি, ইনি হচ্ছে শরীফ, ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের প্রোডাকশন দেখেন। তারপর শাহেদের দিকে তাকিয়ে বলল, ওর নাম শর্মি, অ্যাকাউন্টসে জয়েন করেছে। মেয়েটি লাজুক চোখে শরীফ সাহেবের দিকে তাকালো এবং তিনি তৎক্ষণাৎ শরবিদ্ধ হলেন। লাজুক চোখের মায়াময় চাহনির শর। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল, সব রক্ত উঠে এলো মুখে, তিনি বুঝতে পারছেন না, এরকম হচ্ছে কেন? কথাও বলতে পারছেন না। শাহেদ বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, কী রে তোর কী হয়েছে? একদম চুপ মেরে গেলি। তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন। সেদিন তিনি আধাঘণ্টা সেখানে বসেছিলেন এবং এ অল্প সময়েই তার বোঝা হয়ে গিয়েছিল,

সামনে বসা শ্যামলা মেয়েটি ছাড়া তাঁর আর গতি নেই। চলে আসার সময় তাঁর মনে হলো, আগামীকাল তাঁকে আবার শাহেদের কাছে আসতে হবে–যেকোনো অজুহাতে আসতে হবে, কাল সকালে এ মেয়েটিকে না দেখলে তিনি বাঁচবেন না। কিন্তু কাল কী অজুহাতে আসবেন? তিনি উঠার সময় বুদ্ধি করে শাহেদের টেবিলের নিচে মানিব্যাগ ফেলে এলেন, যাতে এটি নেওয়ার অজুহাতে পরদিন আবার আসা যায়।

মানিব্যাগ ফেলে তিনি সেদিন বাসায় ফিরলেন হেঁটে, রিকশা ভাড়ার টাকা নেই–পথে একটি ফার্মেসি থেকে শাহেদকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তার ওখানে মানিব্যাগ ফেলে এসেছেন কি না? শাহেদ তাঁকে ভুলোমনের জন্য কিছুক্ষণ বকাঝকা করে জানালো, হ্যাঁ, ফেলে এসেছেন, পরদিন এসে যেন নিয়ে যান। শর্মির কাছে আবার যাওয়ার অজুহাত সৃষ্টির অপূর্ব আনন্দ নিয়ে তিনি বাসায় ফিরলেন।

মানিব্যাগ আনার দিন তিনি ছেলে মানুষের মতো একটি কাজ করলেন, তা হলো সেদিন শাহেদের ওখানে ফেলে এলেন গুরুত্বপূর্ণ একটি ডকুমেন্ট। শর্মি নামের মেয়েটিকে প্রতিদিন না দেখলে তাঁর চলবে না।

যেদিন ডকুমেন্ট আনতে গেলেন সেদিন শাহেদ হাসতে হাসতে বললেন, আজ কী ফেলে যাবি?

কী বলিস?

দোস্ত, ভান করিস না। তোকে আমি চিনি, প্রতিদিন এটা সেটা ফেলে যাওয়ার মানুষ তুই না। তোর পক্ষ থেকে প্রপোজালটা শর্মিকে দিয়ে দেখব নাকি? মেয়েটা ভালো।

শরীফ শাহেব বন্ধুর হাত আঁকড়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

এর ঠিক এক মাস পর পারিবারিকভাবেই তাদের বিয়ে হয়। ২০০০ সালে। সতেরো বছর পর আগস্টের এক তপ্ত দুপুরে একটি 'আনফিট' বাস শর্মির রিকশাকে গুড়িয়ে দেয়। স্পট ডেড। তাঁদের একমাত্র সন্তান মালিহার বয়স তখন পনেরো।

ল্যাপটপের সামনে বসে শরীফ সাহেব অসীম শূণ্যতায় ভাসছেন, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন চোখের পানি আটকাতে। পারছেন না।

৩। এপ্রিলের পনেরো তারিখ ভোর চারটায় 'লি ক্যাং' গুয়াংজু হয়ে বেইজিং থেকে ঢাকা এসে নামলেন। এয়ারপোর্টে তাঁকে রিসিভ করলেন শরীফ সাহেব। চাইনিজ ভদ্রলোক যখন তাঁর বাংলাদেশি বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন তখন মনে হচ্ছিলো কোনো এক প্রবাসী যেন অনেকদিন পর দেশে ফিরে এসেছেন, মুখ গুঁজে রেখেছেন দীর্ঘ সময় না দেখা ভাইয়ের বুকে। দুজনেই ভেতর থেকে উগলে আসা আবেগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন, কিন্তু তা পারা যাচ্ছে না।

এয়ারপোর্ট থেকে তাঁরা যখন বাড়ি ফিরলেন তখনো বেশ ভোর, মাত্র সকাল ছয়টা, কিন্তু এরমধ্যেই মালিহা ঘুম থেকে উঠে অতিথির রুম গুছিয়েছে, টেবিলে রাখা হয়েছে কাল রাতে কেনা গোলাপ–সেগুলো একটি কাচের বাটিতে ভাসছে। তারপর নাস্তা বানিয়েছে। বাবা বলেছিলেন, মিস্টার লি বাংলাদেশি খাবার খেতে পছন্দ করেন। তাই সে পরোটা, ভাজি, সিদ্ধ ডিম, পায়েস এবং আপেল দিয়ে সে নাস্তার ব্যবস্থা করলেও সাথে পাউরুটি, মাখন, জেলি, কর্নফ্লেক্স এগুলোও রেখেছে। শেষ মুহূর্তে কী মনে করে সে পাস্তা এবং চিকেন ফ্রাইয়ের ব্যবস্থাও করেছে। দীর্ঘদিনের অনাভ্যাসের কারণে যদি অতিথি বাংলা খাবার খেতে না পারেন।

বাড়ি পৌঁছেই লি ক্যাং মালিহাকে অবাক করে দিয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, ইয়াং লেডি, আমি কি তোমাকে কিছুটা জড়িয়ে ধরতে পারি?

সাথে সাথে মালিহার ভদ্রলোককে ভালো লেগে গেলো। সে হাসতে হাসতে বলল, 'কিছুটা নয়' এটা হবে 'কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরতে পারি?' হাহা। জি, আংকেল আপনি আমাকে জড়িয়ে ধরতে পারেন?

চাইনিজ অতিথি মালিহাকে বুকে টেনে নিলেন। খুব লাজুক তরুণীটির প্রথমে একটু অস্বস্তি লাগলেও পরে দেখলো তা লাগছে না। ভদ্রলোকের জড়িয়ে ধরার মধ্যে একধরনের মায়া আছে।

৪। নাস্তার টেবিলে আয়োজন দেখে লি ক্যাং অবাক হয়ে বললেন, ওহ! মাই গড! এত্ত খাবার! এগুলো কে রান্না করেছে? তিনি কথা বলছেন ইংরেজিতে, বিস্ময় প্রকাশের মতো বাংলা জ্ঞান তাঁর নেই।

শরীফ সাহেব মৃদু হেসে বললেন, মালিহা রান্না করেছে, তুমি বাংলাদেশি খাবার যদি খেতে না পারো তাই কিছু চাইনিজ টাইপ রান্নাও করেছে, হাহাহাহাহা।

আই লাইক পারাটা অ্যান্ড ভাজি–মাই প্রিন্সেস লেডি।

মালিহা লাজুক হেসে বলল, থ্যাংকিউ, আংকেল।

খেতে খেতে শরীফ প্রশ্ন করলেন, সুং জিং কেমন আছে?

সুং জিং লি ক্যাং-এর স্ত্রী। তিনি মৃদু হেসে বললেন, ভালো আছে। তবে কাজের চাপে আমার সাথে আসতে না পারায় মন খারাপ।

শরীফ সাহেব বললেন, ও আসতে না পারায় আমাদেরও মন খারাপ। তোমার ছেলে এখন কী করছে?

বেইজিং ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করে এখন ইউনিভার্সিটি অব কলম্বিয়ায় পিএইচডি করছে।

গ্রেট!

লি ক্যাং পরোটা ছিড়তে ছিড়তে বললেন, তা, আমার এই লিটল প্রিন্সেস কী পড়ছে?

এবার মালিহাই উত্তর দিলো, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে অনার্স পড়ছি।

সো সুইট মাই প্রিন্সেস, তবে পারাটা ভাজিও খুব সুইট–লি ক্যাং বাংলাদেশি খাবার উপভোগ করছেন তা তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

৫। নাস্তা সেরে মিস্টার লি ক্যাং বিশ্রাম নিতে গেলেন। দীর্ঘ যাত্রায় তিনি ক্লান্ত। তাঁকে বাড়িতে রেখে শরীফ সাহেব অফিসে গেলেন, বলে গেলেন আজ বাড়িতেই লাঞ্চ করবেন। একটানা ঘুমিয়ে লি দুপুর দুইটার দিকে উঠলেন। দেখা গেলো তিনি খুশ খুশ করে কাশছেন। শরীফ সাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী শরীর খারাপ লাগছে?

মিস্টার লি উত্তর দিলেন, একটু ঠান্ডা লেগেছে মনে হয়, স্বাভাবিক, বেইজিংয়ে এখন খুব ঠান্ডা পড়ছে। তোমাদের এখানে গরম। ঠান্ডা-গরমে এরকম লাগা স্বাভাবিক।

বিকেলে দেখা গেলো কাশির সাথে হালকা জ্বরও এসেছে। লি রাতে তেমন কিছু খেতে পারলেন না। শরীফ সাহেব একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। তবে ক্লান্ত বলে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেলেন। শরীফ সাহেবও বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। শুধু মালিহা জেগে রইল। তার ভার্সিটির পড়া তৈরি করতে হবে। মাঝরাতে সে কেমন যেন

গোঙানির শব্দ শুনতে পেয়ে নিজের রুম থেকে বের হলো। এত রাতে গোঙাচ্ছে কে? অবাক হয়ে সে দেখলো শব্দ আসছে মিস্টার লি'র রুম থেকে। সে ছুটে গিয়ে বাবাকে ঘুম থেকে জাগালো, তারপর দুজনে মিলে চাইনিজ ভদ্রলোকের রুমে ঢুকে থমকে গেলো। মিস্টার লি বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছেন, যন্ত্রণায় তাঁর মুখ কুঁচকে আছে। তিনি গোঙ্গাচ্ছেন, আ, আ, আ...

শরীফ সাহেব দ্রুত গিয়ে তাঁকে ডাকলেন, লি, লি, কী হয়েছে?

মিস্টার লি কোনো উত্তর দিলেন না, তাঁর চোখ লাল, চেহারায় যেন শরীরের সব রক্ত উঠে এসেছে। মালিহা তাঁর কপালে হাত দিয়ে বলল, বাবা, ওনার তো অনেক জ্বর, বলেই সে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি পানি নিয়ে আসছি, ওনার মাথায় ঢালতে হবে। কয়েক বালতি পানি ঢেলেও কোনো কাজ হলো না। জ্বর যেন বাড়ছেই, সাথে গোঙানি, একবার শুধু লি কোনো রকমে বললেন, ব্যথায় তাঁর মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

রাত তিনটার দিকে শরীফ সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন এ অবস্থায় লিকে বাসায় রাখা ঠিক হবে না। তিনি একটি হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর অনুরোধ করে ফোন করলেন।

৬। হাসপাতালের ডিউটিরত ডাক্তার লি ক্যাং-এর অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। দ্রুত ফোন উঠিয়ে তিনি মাঝরাতে তাঁর সিনিয়রের ঘুম ভাঙালেন। সাধারণভাবে আমাদের ধারণা চিকিৎসকরা অসময়ে রোগী দেখতে আসেন না—জুনিয়রের উপর ছেড়ে দেন। এক্ষেত্রে তা হলো না। সিনিয়র ডাক্তার আধঘণ্টার মধ্যে নিজে গাড়ি চালিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি ইমার্জেন্সি থেকে রোগীকে কেবিনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে স্যালাইনসহ আরো কয়েকটি নল লি ক্যাংকে ঘিরে ধরল।

এরপর প্রায় সাত দিন লিকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি হলো। তাঁর জ্ঞান আসে আর যায়- কিছুক্ষণের জন্য চোখ মেলে তিনি আবার অতলে ডুব দেন। এ সাত দিন তাঁকে ঘিরে রইল মালিহা। শরীফ সাহেব চাইলেও পুরো সময় থাকতে পারেন না। তাঁর অনেক ব্যস্ততা, কিন্তু মালিহা এক মুহূর্ত লিকে ছেড়ে কোথাও গেলো না। শরীফ সাহেব দুএকবার তাকে বাসায় যেতে বললেও সে শক্তভাবে না করে দিলো। বিছানায় শোয়া মানুষটার প্রতি তার কেমন যেন মায়া অনুভব হচ্ছে, আহা! দূরদেশে বেড়াতে এসে কী অসহায়ের মতো হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন তিনি।

আসলে প্রতিটি মেয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে মাতৃরূপ। সময়ে সময়ে তা বের হয়ে আসে।

মালিহা লির পাশে একটি সোফায় বসে থাকে, তাঁর জ্ঞান ফিরলে তিনি এদিক-ওদিক তাকান, তারপর ডাকতে থাকেন, জি চিং, জি চিং...মালিহা বুঝতে পারে না তিনি কাকে ডাকছেন। সে শুধু মানুষটার মাথায় হাত বুলাতে থাকে আর বলে, আমি আছি, আংকেল, আমি আছি, আই অ্যাম হিয়ার। তার নরম হাতের স্পর্শ নিয়ে লি ক্যাং আবার জ্ঞানহীনতায় ডুব দেন। কিছুক্ষণ পর আবার জ্ঞান আসে, তিনি এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে ডাকেন, জি চিং, জি চিং...

মালিহা একবার শরীফ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো, বাবা, উনি জ্ঞান ফিরলেই জি চিং নামের কাউকে খোঁজেন। উনি কে? তুমি জানো?

শরীফ সাহেব বললেন, ওর স্ত্রীর নাম সু জিং, ছেলের নাম লি সুং, কিন্তু জি চিং কে আমিও তো বুঝতে পারছি না, মা? তবে লি-এর মায়ের নাম হতে পারে। রোগশয্যায় সন্তানেরা মাকেই সবচেয়ে বেশি খুঁজে। বলেই তিনি থতমত খেয়ে গেলেন, কারণ মালিহার চেহারা কালো হয়ে গেছে, তার মনে হয় মায়ের কথা মনে পড়েছে।

৭। লি ক্যাং-এর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দশ দিন লেগে গেলো। দুদিন পরই তাঁর ফিরতি ফ্লাইট। শরীফ সাহেব একবার ফ্লাইট পেছানোর কথা বললেন, মিস্টার লি তাতে রাজি হলেন না, তাঁর দেশে জরুরি কাজ আছে। তিনি আফসোস করে বললেন, এসেছিলাম কদিন তোমাদের সাথে আনন্দে সময় কাটাব বলে, মাঝখানে কী ঝামেলায় ফেললাম।

শরীফ সাহেব তাঁর হাত ধরে বললেন, এভাবে বলো না, বরং আমাদের খারাপ লাগছে তুমি এসেই অসুস্থ হয়ে পড়লে। আমাদের কত জায়গায় ঘোরার প্ল্যান ছিল।

তোমার মেয়েটা একটা হীরার টুকরা, শরীফ, সে আমাকে মায়ের যত্নে সুস্থ করে তুলেছে।

এটা তার দায়িত্ব ছিল, লি, আমি অসুস্থ হলে সে সেবা করতো না?

তোমাদের দেশের সাথে চিনের একটি মিল আছে, তা হলো পারিবারিক বন্ধন, অন্যের জন্য মায়া— কিন্তু দিনদিন তা আমার দেশে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার ছেলেটা মাসেও একবার ফোন করে না। তোমরা ভাগ্যবান এখনো